ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1079-1085
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.325

ফেরারি ফৌজ, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অন্য অধ্যায় ও নিম্নবর্গের অবস্থান

প্রতাপ বিশ্বাস, *স্বাধীন গবেষক, আদর্শপল্লী, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The people situated at the lower strata of the social pyramid, who have long been identified as timid and cowardly, lacking independent thought and consciousness, and sustained by the leftovers of society, are reimagined by Utpal Dutt in his play with a different identity. He places in their voices a new language of protest. Instead of marching in the traditional procession of silence, they transform history and establish themselves as counterparts to the upper classes. *"Ferari Fauj"* narrates the story of such a marginal community, who, under British-ruled India, succeeded in shedding the stigma of cowardice. They became capable of standing upright with dignity and voicing resistance. Those individuals who usually dissolve into the crowd without any distinct identity are presented in the play with a unique and powerful dimension.

Keywords: Lower Class, Capitalism, Subaltern, Rebellion, Cowardice

সমাজ বিজ্ঞানের পরিসর ছাড়িয়ে আমরা যদি জীব বিজ্ঞানের দিকে নজর ঘোরাই, সেখানে খাদ্য পিরামিড বলে একটি তত্ত্ব কাজ করে। জীবের মধ্যে যে খাদ্য খাদক সম্পর্ক সেখানে খাদ্য শ্রেণির অবস্থান সব সময়ই তলদেশে। সংখ্যাগত দিক থেকে তাদের পরিমাণ বেশি হলেও চিরকালই তারা খাদ্য, খাদক শ্রেণির ভরণ পোষণের দায়টা তাদের উপরেই চাপে। এবং সেই দায় মেটাতেই তাদের যুগের পর যুগ ছুটে চলা।

ঠিক তেমনই সমাজবিজ্ঞান চর্চাতেও দেখা যায়, আমাদের সমাজে চিরকালই একদল মানুষ থাকে, যারা ঠিক মানুষ নয় অথবা যাদের মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি। তারাই সমাজের বাহন; চিরকালই সমাজের উচ্ছিষ্টে তারা লালিত পালিত। দিন শেষে তাদের প্রাপ্য শুধুই বঞ্চনা। কারণ অসম পুঁজিবাদের বণ্টনে তাদের জন্ম। যুগ যুগ ধরে সমাজ সভ্যতার দীপ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা, নিজে জ্বলে আলো বিতরণ করে চলেছে। প্রাবন্ধিকের মতানুযায়ী, আমাদের দেশ ভারতবর্ষের দুটি ভাগ-

> "একদল ভারতবাসী থাকেন ইন্ডিয়া-য়, আরেকদল ভারতবর্ষ-এ। এই দ্বিতীয় দলের সংখ্যা ভারী..... সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করলে উচ্চবর্গের ভারত এবং নিম্নবর্গের ভারত।"[১]

এখন প্রশ্ন হল নিম্নবর্গ কি? বা কারা? সমাজ তত্ত্বের আলোচনায় 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি এসেছে মূলত মার্কস চর্চার সূত্র ধরে। ইতালির বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা আন্তেনিও গ্রামসি তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোটবই' (A Prisonar's Note Book, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালে রচিত) গ্রন্থে মার্কস-এর ভাবনাকে মুসোলিনির প্রহরা

এড়িয়ে 'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণি অর্থে 'সাবলটার্ন' শব্দটি সুকৌশলে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপকার্থে এই প্রতিশব্দটি ইতালির পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মেহনতি মানুষকেই বোঝায়। মার্কসীয় তত্ত্বের দুটি পরিচিত পরিভাষা 'পুঁজিমালিক' বা 'বুর্জোয়া' এবং 'প্রলেতারিয়েত' গ্রামসির আলোচনায় ভিন্ন দুটি পরিভাষা দ্বারা প্রযুক্ত হল। গ্রামসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিচিতি লাভ করল 'প্রাক্সিসের দর্শন' হিসেবে। 'বুর্জোয়া' পরিভাষাটি গৃহীত হল 'হেজেমনিক' ও 'প্রলেতারিয়েত' পরিভাষার পরিবর্তে ব্যবহৃত হল 'সাবলটার্ন' প্রতিশব্দ। ইতালীয় শব্দ 'সুবলতের্নো' থেকে গ্রামসি নির্বাচন করেছেন 'সাবলটার্ন' শব্দ। সেক্ষেত্রে মূলত শ্রমিকশ্রেণিকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে শব্দটি। তবে 'নিম্নবর্গ' ইংরেজি 'সাবলটার্ন' (subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। ইংরেজিতে সাবলটার্ন শব্দটি সামরিক বাহিনী তথা সামরিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদেরই সাবলটার্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আভিধানিক অর্থ এই রকম– "Under the control or influence of someone or something that is more powerful"[২]; অর্থাৎ সাবলটার্ন মানে অধস্তন, নীচে যার অবস্থান। আবার অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী "সাবলটার্ন হচ্ছে এমন কোন বচন যা সব সময় অন্য বচনের অধীন– যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়।"[৩] অধীন অর্থাৎ পুঁজিবাদী অসম বণ্টনে কতৃত্ব, ক্ষমতা, আধিপত্যের অধীন। এবং এই অধীনতার কবলে পড়েই একদল ক্রমশ নীচে নেমে আসে। এই নীচে থাকা মানুষেরাই নিম্নবর্গ। সমাজ স্তরের সর্বক্ষেত্রেই এরা পরিত্যক্ত।

সুতরাং ব্যপকার্থে সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের ধারায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যারা প্রভুত্ব বিস্তার করে, তার বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণীই সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গ। এই মানদণ্ডের বিভাজনে শ্রমিক শ্রেণি, গরিব চাষি, মজুর সবাই নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল।"[৪]– তারাই উচ্চবর্গ। এই বিভাজন মেনে উচ্চবর্গ বহির্ভূতদের বলা হয় নিম্নবর্গ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে 'ক্ষমতা' শব্দের মাপকাঠিতে বিভাজিত হয় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ। 'সাবলটার্ন' প্রসঙ্গে গ্রামসি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের ধারায় এক শ্রেণি বরাবর শাসন বিস্তার করে। প্রভুত্বশক্তির অধিকারী হয়ে তারা আধিপত্য কায়েম করে রাখে অন্য শ্রেণির উপর। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই প্রভুত্ব বিস্তারকারী শ্রেণির বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণিই প্রতিপন্ন হয় 'সাবলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' হিসেবে। নিম্নবর্গ ধারণার সহজ সরলীকরণ হল প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্ক। প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্ক চিরকালীন বিরোধিতার সম্পর্ক। গ্রামসি হেজেমনিক শ্রেণির প্রভাব-প্রতাপকে চিহ্নিত করেছেন সাবলটার্ন শ্রেণির অভাব-অস্তিত্বের কারণ হিসেবে।

সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নবর্গ আজ একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায়, উচ্চবর্গের রাজনীতি ও ভাবাদর্শের মধ্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের মানুষেরা উপস্থাপিত হয় ভীরু, উচ্চবর্গের অনুগত প্রাণী হিসেবে। উচ্চবর্গ তখনই নিম্নবর্গকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মান্যতা দেয় যখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

> "একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়েই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।"[৫]

ইতিহাসের কর্তব্য সত্যকে উপস্থাপিত করা। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, কারণ ইতিহাসের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের প্রবেশ অনেক আগে থেকেই। যদিও বিশ শতকের শেষ দিকে এদেশে সাবলটার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রাগাধুনিক সাহিত্যে অনেক আগে থেকেই শ্রেণি বিভাজন, বৈষম্য, নিম্নবর্গের প্রতি অবমাননার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত সব ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের কথা উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎসাহিত্য সবস্থানেই নিম্নবর্গের বিচরণ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে বিষয় ভাবনায় তথা দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপনে বাঁকবদল ঘটে কল্লোল সাহিত্যিকদের হাত ধরে। প্রান্তজন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সরাসরি কলম ধরেছেন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় বিদ্রোহ ঘোষণাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের ধারা থেকে সরে এসে স্বকীয়তার পথ নির্মাণে কল্লোল গোষ্ঠির লেখকরা নেমে দাঁড়ালেন শ্রমিক- মজুর- বস্তিবাসী- ফুটপাতবাসী সমাজের অবহেলিত নানাশ্রেণির পতিত ও অপাংক্তেয় মানুষের বিচিত্র জীবনযন্ত্রণার গলিপথে।

রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে সরে এসে তাঁরা সর্বহারা মানুষের জীবন দর্শন নির্মাণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত জীবন থেকে সরে এসে দৃষ্টি রেখেছেন মানুষের অন্ধকারময় জীবনে। কয়লাকুঠির পরিচয়দানে বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়েছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষের সংস্পর্শ লাভ করায় সেখানকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাঁওতাল, বাউরি, হাড়ি, ডোম, কুলি, কামিন অধিগ্রহণ করেছে তাঁর সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। তাঁর 'কয়লাকুঠি', 'মা' গল্পগুলি কয়লাকুঠির অধিবাসীদের নিখুঁত জীবননির্বেদ উপস্থাপিত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন চিত্রের রূপ নির্মাণে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি, তাদের জীবনচেতনার স্বরূপ চিত্রিতমণ্ডিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে। অখ্যাতজনের কথাকার তারাশঙ্করের সাহিত্যে পটুয়া, বেদিয়া, বাজীকর, সাপুড়ে, ঠ্যাঙারে, বাউল, বোষ্টমী– প্রভৃতি নানাশ্রেণির অকিঞ্চিৎকর মানুষের মজলিস। পিলসুজের নীচে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া জনপদ ডোম, বাউরি, বাগদি, কাহার, বেদে, সাঁওতাল প্রভৃতি অপজাত শ্রেণি তারাশঙ্করের লেখনীর আলোকবৃত্তে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্য প্রান্তিক মানুষের জীবনাচরণ, বৃত্তি, প্রবৃত্তি নিবিড় চেতনার পরিচয়ে সমৃদ্ধ। ছোটোজাত কাহার জনগোষ্ঠীর জীবনের উপকথা উচ্চারিত হয়েছে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। 'কালিন্দী', 'কবি', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' প্রভৃতি উপন্যাসের মর্মমূলে প্রোথিত প্রান্তিক মানুষের ঘনিষ্ঠতা। ডোম সমাজের বলিষ্ঠ অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে 'কবি' উপন্যাসে। জাতপাতবিষয়ক সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সংস্কারে চরম আঘাত হেনেছে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস। গণজীবনের স্পষ্ট প্রকাশক রূপে উত্থিত হয়েছে 'গণদেবতা' উপন্যাস। পদ্মার জনজীবনকে কেন্দ্রমুখ করে সাহিত্য রচনায় বলিষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মার তীরবর্তী জেলেপাড়ার জীবনাচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গ্রামজীবনের নির্বিত্ত শোষিত মানুষের অবিন্যস্ত জীবন-যাপন, কাম-প্রণয়, স্বার্থ-সংকীর্ণতা চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। কেতুপুর গ্রামের পটভূমিতে বেড়ে ওঠা চরিত্র সকল- কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয়, মালা, যুগল, রাসু, যুগী, গোপী ও অন্যান্যদের জীবনযাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে দারিদ্র্যের প্রবল সংঘর্ষে।

সাম্প্রতিককালে এ ধারায় রয়েছেন অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখ। বিশ শতকের প্রথম দশকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। উৎপল দত্তের বেড়ে ওঠা এই কালখণ্ডে। তার মানুষ সংক্রান্ত চেতনা শ্রেণি সমাজের বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী মানুষ সম্পর্কে তার গভীর জীবন বোধ তার নাটক গুলিকে সফলতা দান করেছে। তাঁর নাটক নিছক অবসর বিনোদনের মাধ্যম নয়, ঘুন ধরা বিকলাঙ্গ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তা একাধারে অস্ত্র, যে অস্ত্র 'টিনের তলোয়ার' নয়, তা 'রাইফেল'। উৎপল দত্তের নাটক গুলির মধ্যে আবার পাওয়া যায় শ্রেণি চেতনা, ইতিহাস চেতনা। যে শ্রেণি চেতনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে।

নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা স্বীকরণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকার বিশিষ্টতা বিষয়েও মনোনিবেশ করা হয়েছে এক্ষেত্রে।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের মতে, ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের যে কণ্ঠস্বর উঠে আসে সেটি তার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী স্বর নয়, তা অন্যের নির্মাণ। "ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ।"[৬] কিন্তু উৎপল দত্ত সেখানই এক বিপরীত মুখী চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের প্রান্তিক জনগণের প্রভাব না থাকলেও তাদের অস্তিত্ব কিন্তু রয়ে গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। ভুবন ডাঙার কৃষক সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে দেবতা রূপে। সূর্য সেন তাদের কাছে কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, সূর্য সেন এক আবেগ, সমাজের বুকে এসে লাগা এক ঢেউয়ের ধাক্কা। তাইতো সূর্য সেনকে যদি পুলিশ ধরে ফাঁসি দেয়, সে কথায় এক কৃষকের উক্তি, "দিউক। এক সূর্য স্যান যাউক, তার স্থানে আইব আর একজন। তারপর আর এক।"[৭] অর্থাৎ সূর্য সেন ভুবন ডাঙার সাধারণ মানুষদের কাছে এক না শেষ হওয়া মুক্তির সুখ। যে সুখের শেষ কোনও একজনকে ফাঁসি দিয়ে শেষ করা যায় না। তাইতো সূর্য সেন হোক, বা তার শিষ্য শান্তি রায়, তারা এই সর্বহারা মানুষদের কাছে দেবতার স্বরূপ, এক না শেষ হওয়া গল্প তথা তাদের মনের বিশ্বাস।

নাটকে তথাকথিত এই নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের ইংরেজ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপটি উঠে না এলেও, পরোক্ষ ভাবে তারাও কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনে যারাই সামিল তারাই তো স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাইতো চণ্ডী গ্রামের সাধন ডোম তার ঘরে শান্তি রায়কে লুকিয়ে রাখার সময়ে একবারও ভাবেনি তার পরিণামের কথা। যার ফলও তাকে ভুগতে হয়েছে অবসম্ভাবি রূপেই, তার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও ভাবেই কি তাদের মনে থেকে স্বাধীনতার বীজকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে? কখনোই না, কারণ সূর্য সেনদের চোখের যে আগুন, সেই আগুন প্রভাবিত করেছে তাদেরকে, সেই আগুন সঞ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যেও। কারণ শান্তি রায়, সূর্য সেনরা তাদের কাছে শুধুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়, তারা তাদের কাছে এক আবেগ, মুক্তির আরেক নাম। তারা তাদের কাছে কারাবালার প্রান্তরের হাসান হোসেনের সমান। তাইতো শিবু মণ্ডলের একরত্তি ছেলেটিও পুলিশের সামনে চীৎকার করে ওঠে, "বন্দেমাতরম্! ইনক্লাব বিন্দাবর! ইনক্লাব বিন্দাবর!"[৮]

শুধুমাত্র এই কৃষক সম্প্রদায়রা নয়, পিছিয়ে নেই স্টিমার ঘাটের মাঝি মাল্লা, শ্রমিক সম্প্রদায়ও। পলাতক সংগ্রামীদের স্টীমারে পাচার করতে তারাই একমাত্র সহায়, এবং সে কাজে যে তারা পিছুপা নয় তা প্রমাণিত হয়েছে সিরাজুলের কথাতেই, "মাল্লাগো আর কইতে হইব না। শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলে টানা দেখলাম অত্যন্ত সহজ।"[৯] সিরাজুলের কথাতেই প্রমাণিত যে তথাকথিত মেরুদণ্ডহীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থেকে এইসব অশিক্ষিত, তথা সমাজের প্রান্তিক সম্প্রদায়ই সেদিন স্বাধীনতার গুরুত্বকে বেশি অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারাই চেয়েছিল স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করতে। তাইতো এই পর্যায়ে এসে নাটকের তথাকথিত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়, যারা কিনা স্বাধীনতার ব্রতকে মনে প্রাণে আপন করে নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছে তাদের চোখেও সূর্য সেন আর এই সর্বহারা সম্প্রদায় এক আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, "সেই কন্ডিশনে গায়ের নিতাই বাগদী ও সূর্য স্যানে কোনো ডিফারেন্স থাকে না।"[১০]

নিম্নবর্গের ইতিহাস আমাদেরকে আর একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে, তা হল সমাজে নারীর অবস্থান। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ।"[১১] কাজেই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাণ করতে হলে সমাজে নারীর অধীনতার বিষয়টিও গবেষণার বিষয়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে

অদ্যবধি আমাদের সমাজে নারী শুধুই অবহেলার পাত্র। নারী শৈশবে তার পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে সন্তানের অধীন। তার নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব চিন্তা চেতনা গড়ে ওঠার সুযোগ কোনটাই এই পুরুষশাসিত সমাজে স্বীকৃত হয়নি, হয়না। নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা সমস্ত বিষয়েই পুরুষ সমাজ তাদেরকে নিজের গণ্ডির মধ্যেই আটকে রেখেছে চিরকাল। সে সমাজ উচ্চবর্গের হোক বা নিম্নবর্গের, নারী সেখানে চিরকালই অধীনস্থ। সন্তান উৎপাদন, সংসার প্রতিপালন এই তাদের মূল প্রতিপাদ্য। 'প্রান্তজন' ধারণার তাত্ত্বিক কক্ষপথে নারীর অবস্থান, অস্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে অতি সহজে। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ অকপটে স্বীকার করেছেন নারীর বিপর্যয়কে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ উভয় সমাজশৃঙ্খলায় নারীর অবস্থান অসহায়, অধীনস্থ।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের কাছে উচ্চবর্গের সমাজে নারীর অধীনতার পাশাপাশি নিম্নবর্গের সমাজে মেয়েদের অধীনতার বিষয়টিও সমানভাবে আলোচ্য বিষয়। কারণ বর্গভেদে পুরুষশাসিত সমাজের গাঠনিক চেহারাই মেয়েদের অধীনস্থ অবস্থানের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে যুগান্তরব্যাপী। মেয়েদের সম্পর্কে সামাজিক ধ্যান-ধারণা, মানসিকতার প্রতিফলন কখনোই সরল-সমানুপাতিক নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই অবরোধ-অবদমনের চিত্র প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থায়। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা-বিন্যাসই সামাজিক গড়নকে মেয়েদের জন্য অবনত রেখেছে। চাপিয়ে দেওয়ার শাসন-রাজনীতি প্রতিফলিত হয়েছে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে। আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থায় এর চূড়ান্ত প্রতিরূপ পাওয়া যায় মনুসংহিতার কাল থেকেই। মানসিক দৃষ্টিপ্রক্ষেপেই চূড়ান্ত অবমাননার পরিচয় রেখেছে মনুশাস্ত্র। একটি মেয়ে, একটি সাপ, একটি বেজি, একটি বাজপাখিকে সমতুল্য হিসেবে বিচার করা হয়েছে। প্রান্তবর্গীয় সমাজ-কাঠামোও এই সনাতনী চিন্তাধারা, ব্যবস্থা থেকে পৃথক হতে পারেনি। প্রতিটি প্রান্তিক গোষ্ঠী নিজেদের মতো সংস্কার-শৃঙ্খলার কাঠামো তৈরি করেছে বটে; কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে গঠনমূলক ধ্যানধারণা, মানসিকতার প্রকাশ ঘটেনি বিশেষ। বরং শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায়ের বিষয়গুলো নারীর অধীনতাকে তরান্বিত করেছে বেশিমাত্রায়।

ফলে অবদমন, অবমাননার ফলশ্রুতিই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে মেয়েদের নিয়তি-অদৃষ্টে। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের পর্যালোচনায় লিঙ্গগত বৈষম্যই প্রতিফলিত হয়েছে চূড়ান্তরূপে। আসলে, মেয়েদের প্রতি অবমাননার ক্ষেত্রে বর্গভেদ অভিন্ন সত্তায় ধরা পড়লেও প্রান্তিক সমাজে পুরুষ-শাসনের কঠোর অনুশাসনে গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে মেয়েরা। নারীবাদের কোনও একক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। মূলত পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণির অবস্থানের মধ্যে নারীবাদের সূত্র লুকিয়ে আছে। বুর্জোয়া শ্রেণি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ব্যবস্থার শ্রম বিভাজন ছিল লিঙ্গভিত্তিক। পুরুষের কাজ ছিল বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, আর নারী ছিল অন্দরমহলে। সন্তানপালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনযাপনই ছিল তার কাজ । বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় তাই নারীর ভূমিকা ছিল গৌণ। এই সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের প্রায় দেড়শ বছর পরে ১৯৪৯ সালে ফরাসি দার্শনিক 'সিমোন দ্য বোভোয়া' নারীর সামাজিক অবস্থানকে second sex (দ্বিতীয় লিঙ্গ) বলে অভিহিত করলেন প্রতিবাদের স্বরে।

কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রমী দিক নিয়েই উঠে এসেছে 'ফেরারি ফৌজ'। যে সমাজ নারীদেরকে চিরকালই পিছিয়ে রাখতে চায়, বলা ভালো যে রাখতে অভ্যস্ত, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সেই সমাজেই নারী উঠে এসেছে তার বিদ্রোহিণী রূপ নিয়ে। অন্দরমহলে থেকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন বা সংসার ধর্ম পালনই নয়, নারী উঠে এসেছে এক অন্য মাত্রা নিয়ে। নাট্যকার তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন অন্য রূপে। সেই কারণেই হয়তো উৎপল দত্ত তাঁর নাটকটি উৎসর্গ করলেন পরাধীন ভারতের অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্তকে। হ্যাঁ এটা ঠিকই পরাধীন ভারতে প্রীতিলতা বা কল্পনা দত্তদের মত এ-নাটকের নারী চরিত্ররা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু এও ঠিক যে তারা সেখানে পিছিয়েও নেই। যে নারী বিপ্লবিদের সহায়তা করতে পারে, বা যে নারী নিজের সন্তানকে

স্বাধীনতা আন্দোলনে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে, নিজের সম্মান বিসর্জন দিতে পারে সে কখনোই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

অশোকের পিতা শিক্ষিত রুচিসম্মত হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনা ছেড়ে নিজের ছেলের স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়া যেখানে মেনে নিতে পারছেন না, সেখানে বঙ্গবাসী কিন্তু অবলীলায় নিজের ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে তার কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানিয়েছেন, দেশের জন্য নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করেছেন। সমর্থন জানিয়েছেন ছেলের দলের আইন শৃঙ্খলাকে। তাইতো যেখানে যোগেন ছেলের চিন্তায় ব্যকুল, বঙ্গবাসী সেখানে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন, "যে দেশের স্বাধীনতা নেই, সে-দেশ জ্ঞান দিয়ে কি করবে?"[১২] অর্থাৎ পরাধীনতার যন্ত্রণাটা সামান্য গৃহবধূ হয়েও বঙ্গবাসী অনুধাবন করতে পেরেছেন। চেয়েছেন সেই শৃঙ্খল মোচন করতে, তাইতো আজ অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে তাদের বেরিয়ে আসা। পিছিয়ে নেই অশোকের স্ত্রীও, নিজের স্বামীর চিন্তায় ব্যকুল হলেও তাকে মনের মধ্যে দমিয়ে স্বামীর আদর্শ, স্বামীর কর্মকে নীরব সমর্থন জানিয়েছে সে। পুলিশের অত্যাচারের মুখেও সে মুখ খোলেনি। ধর্ষিতা হয়েছে এই বর্বরদের দ্বারা, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের স্বামীর আদর্শকে ত্যাগ করেনি। বরং অশোকের রাজসাক্ষী হওয়ার ঘটনায় তারা নিজের সন্তান তথা স্বামীর বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত হয়েছে, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছে তার সাথে। অর্থাৎ তাদের কাছে অশোকের চেয়ে তার আদর্শ, দেশের প্রতি ভালবাসাই বড়। সন্তান সেখানে নগণ্য, দেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

সমাজের অতি প্রাচীন পেশায় নিযুক্ত রাধাও পিছিয়ে নেই, নিজের বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজের ঘরে সে আশ্রয় দিয়েছে বিপ্লবীদের। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর চেয়ে তার অবদান কিছু কম নয়। এই মহান কাজে ব্রতী হতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। সমাজের পাঁকে অবস্থান করেও সে নিজেকে এই পবিত্র কাজে উৎসর্গ করতে পেরেছে। তাই যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি রায় বলেন, "দেশমাতৃকা আমার কাছে একটা নিছক কল্পনা নয়। তার মুখ ঠিক-ঠিক ঐ রাধার মতন সে দেখতে।"[১৩] তখন তার এই কথাকে কোনোমতেই অত্যুক্তি বলে মনে হয়না। ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের কাজে তার যে বীর সন্তানদের প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে, সেখানে ঘরের এই গৃহবধূদের যেমন অবদান রয়েছে, ঠিক তেমনই অবদান রয়েছে এই রাধাদেরও। দেশ তো সবাইকে নিয়েই।

সমাজের ভিড়ে মিশে যাওয়া এই মানুষদের আলাদা করে কোনও আইডেন্টিটি থাকে না, থাকেনা কোনও মূল্য, তাদের পরিচয় শুধুই ক্রাউড হিসেবে, নাটকেও তাদের অবস্থান হয়েছে জনতা হিসেবেই। উচ্চবর্গ তখনই এদেরকে মান্যতা দেয় যখন এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে সেই বিদ্রোহের রূপ নিয়ে, স্বাধীন হওয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে তারা। ভীরু তথা উচ্চবর্গের অনুগত, এই তকমা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সহযোদ্ধা হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থিত করেছে নাটকে। এবং বলাবাহুল্য নাট্যকার তাদের মুখে প্রতিবাদের এক অন্য ভাষা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কাজেই কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা অপ্রত্যক্ষ, যেভাবেই হোক না কেন নাটকে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

উল্লেখপঞ্জি:

১। মাঝি, বিপ্লব (সম্পা.) সন্ধান। নিম্নবর্গ সংখ্যা। কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩, পৃ. ১২৩।
২। মজুমদার সেন, জহর। নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৭, পৃ. ১১।
৩। তদেব, পৃ. ১১।
৪। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ৩২।
৫। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ৮।

৬। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭।
৭। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ১৩।
৮। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ২০।
৯। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ২৫।
১০। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ৫৩।
১১। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ২০।
১২। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ৩২।
১৩। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ৮১।